প্রযুক্তি বুকলেট

হাঁস পালন

সহযোগিতায়ঃ

	মানিকগঞ্জ, ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলার নদীবিধৌত চরাঞ্চলের সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষিখামার সড়ক, ফার্মগেইট, ঢাকা-১২১৫।	

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

হাঁস পালন

ভুমিকা

বাংলাদেশের নদী-নালা, খালবিল, হাওড়, পুকুর, ডোবা এছাড়াও আবহাওয়া ও জলবায়ু হাঁস পালনের জন্য উপযোগী। গ্রামীণ পরিবেশে হাঁস প্রাকৃতিক খাদ্য খেয়ে থাকে। এই কারণে একজন খামারী হাঁসকে সামান্য পরিমান খাদ্য প্রদান করে সারা বছরই লাভজনকভাবে হাঁস পালন করতে পারে।

হাঁস পালনের উদ্দেশ্য ঃ

- দুস্থ, কর্মহীন ও বিধবা মহিলাদের কর্মসংস্থানে সাহায্য করা।
- প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ করা।
- পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা।
- হাঁসের ডিম এবং বাড়ন্ত হাঁস বাজারে বিক্রি করে বাড়তি অর্থ দিয়ে জীবন-মান উন্নয়ন।
- খামারীগণ ঘরে বসে স্বল্প পুজি খাটিয়ে অধিক লাভবান হতে পারে।

উন্নত জাতের হাঁসের জাত ও বৈশিষ্ট্য ঃ

খাকী ক্যাম্পবেল

উৎপত্তি স্থানঃ ইংল্যান্ড

বৈশিষ্ট্য ঃ

- পালকের রং খাকী।
- ডিমের রং সাদা।
- ঠোঁট নীলাভ বা কালচে।
- বার্ষিক ডিম উৎপাদন গড়ে ২৫০-৩০০ টি।

প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসের গড় ওজন ২.০-২.৫ কেজি।

খাকী ক্যাম্পবেল

জেনডিং

উৎপত্তি স্থান ঃ চীন

বৈশিষ্ট্য ঃ

- হাঁসের পালকের রং কালো ও সাদা মিশ্রিত
- হাঁসীর পালকের রং খাকীর মাঝে কালো ফোঁটা।
- ডিমের রং নীলাভ।
- ঠোঁট নীলাভ বা হলদে।
- বার্ষিক ডিম উৎপাদন গড়ে ২৭০-৩২৫ টি।

প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসের গড় ওজন ২.০-২.৫ কেজি

জেনডিং

❖ **পিকিং**

❖ উৎপত্তি স্থান ঃ চীন

❖ বৈশিষ্ট্য ঃ

❖ হাঁসের পালকের রং সাদা।

❖ ডিমের রং সাদা।

❖ বার্ষিক ডিম উৎপাদন গড়ে ১৫০ টি।

❖ প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসের গড় ওজন ৪.৫ কেজি এবং হাঁসির গড় ওজন

৪.০ কেজি

পিকিং

মাসকোভি

উৎপত্তি স্থান ঃ দক্ষিণ আমেরিকা

বৈশিষ্ট্য ঃ

❖ হাঁসের পালকের রং সাদা ও কালো।

❖ মাথায় লাল ঝুটি।

❖ ডিমের রং সাদা।

❖ বার্ষিক ডিম উৎপাদন গড়ে ১২০ টি।

প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসের গড় ওজন ৫ কেজি এবং হাঁসীর গড় ওজন ৪.০ কেজি।

মাসকোভি

ইন্ডিয়ান রানার

উৎপত্তি স্থান ঃ ভারত

বৈশিষ্ট্য ঃ

❖ হাঁসের পালকের রং সাদা বা বিভিন্ন রংয়ের মিশ্রণ।

❖ ডিমের রং সাদা।

❖ বার্ষিক ডিম উৎপাদন গড়ে ১৮০ টি।

প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসের গড় ওজন ১.৫-২.০ কেজি।

ইন্ডিয়ান রানার

হাঁসের বাসস্থান ব্যবস্থাপনা

হাঁস খুব বেশী গরম ও খুব বেশী ঠান্ডা সহ্য করতে পারে না । হাঁসের ঘর নির্মাণ করতে গিয়ে বেশী খরচ না করে সীমিত খরচের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিৎ। আবার বাসস্থান নির্মাণ করতে গিয়ে এমন নড়বরে ঘর রাখা উচিৎ নয় যাতে শিয়াল, বন বিড়াল, নেউল, চিকা, ইদুর ইত্যাদি হাঁস ও হাঁসের বাচ্চার ঘরে প্রবেশ করে ক্ষতি করতে পারে।

বাসস্থান ঃ

- বাসস্থান এমন জায়গায় হতে হবে যা রোদ, বৃষ্টি ও ঠান্ডা থেকে মুক্ত থাকে।
- ঘর বন্যা ও জলাবদ্ধতা থেকে মুক্ত উচু জায়গায় স্থাপন করতে হবে।
- পর্যাপ্ত আলো ও মুক্ত বাতাস চলাচলের সুযোগ থাকতে হবে।
- আসে পাশের খামার, বসতবাড়ী ও রাস্তা হতে দূরে খামার স্থাপন করতে হবে।
- এক খামার হতে অন্য খামারের দূরত্ব কমপক্ষে ২০০ মিটার হওয়া উত্তম।
- খামারের প্রয়োজনীয় মালামাল পরিবহন, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করণের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- বিশুদ্ধ পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- বিষ্ঠা ও লিটার ব্যবস্থাপনার সঠিক ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- মুরগীর খামারের সন্নিকটে হাঁসের খামার স্থাপন করা যাবে না।
- প্রতিটি হাঁসের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমান হাঁসের জাত ও পালন পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল।
- আবদ্ধ অবস্থায় প্রতিটি হাঁসের জন্য সাধারণত ৩-৪ বর্গফুট এবং রান টাইপ পালন ব্যবস্থায় প্রতিটি হাঁসের জন্য ১৫ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন হয়।

ঘরের তাপ ও আর্দ্রতাঃ

ঘরের তাপ ৪.৪ ডিগ্রী সেঃ এর কম বা ৩৭.৮ ডিগ্রী সেঃ এর বেশী হলে তা হাঁসের জন্য ক্ষতিকর ।

ঘরের তাপ সাধারণত ১২.৮ ডিগ্রী সেঃ থেকে ২৩.৯ ডিগ্রী সেঃ পর্যন্ত উত্তম। ঘরের আর্দ্রতা হাঁস উৎপাদনের গুরুত্বপুর্ণ নিয়ামক।

আবহাওয়া ভাল থাকলে হাঁসের শারীরিক বৃদ্ধি, লোম গজানো এবং ডিমের উৎপাদন ভাল হয়। তাছাড়া অপ্রাকৃতিক পরিবেশ ডিম উৎপাদনে ক্ষতি করে।

হাঁস সাধারণত ৭০% আর্দ্রতা সহ্য করতে পারে। আর্দ্রতা শতকরা ৩০% এর কম হলে হাঁসের পাখনা ঝরে যায়। ঘরের আর্দ্রতা ৭০% এর উর্দ্ধে হলে কক্সিডিয়া ও

কৃমির উৎপাত বাড়ে এবং হাঁসকে অস্থির অবস্থায় দেখা যায়। প্রতিকারের একমাত্র উপায় ঘরের লিটার শুকনা রাখা এবং বায়ু চলাচলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা।

ঘরের আলো (কৃত্রিম) ঃ

সঠিক আলোক ব্যবস্থাপনা হাঁসের দৈহিক গঠন, বৃদ্ধি এবং ডিম উৎপাদনে সহায়তা করে । ৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত হাঁসের বাচ্চার জন্য রাতে আলোর ব্যবস্থা রাখা বাঞ্ছনীয়। তবে মাঝে মাঝে আলো বন্ধ করে এদেরকে অন্ধকারের সাথে পরিচিত করতে হবে। আলোক সরবরাহ সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করা হলে খাদ্য বেশি খাবে এবং দৈহিক ওজন বৃদ্ধি পাবে। ডিম দেয়া হাঁসের জন্য ১৪-১৬ ঘন্টা আলো সরবরাহ উত্তম।

ঘরের লিটার (বিছানা)ঃ

লিটার বা বিছানা সর্বদা শুকনা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। সুতরাং আর্দ্রতা শোষণ করতে পারে এমন কিছু লিটার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে । ধানের খড়, ধানের তুষ, কাঠের গুড়া ইত্যাদি লিটার হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

ধানের তুষ বা কাঠের গুড়া ব্যবহার করলে উঁচু লিটার (৩”-৪”) ব্যবহার না করে পাতলা লিটার (১”-২”) ব্যবহার করতে হবে।

ডিমপাড়ার বাসাঃ

- মেঝে বা মাচায় হাঁস পালন করলেও ঘরে সাধারণত ডিম পাড়ার বাসা দিতে হয় না।
- হাঁস সাধারনত হাঁস লিটার এর উপর ডিম পাড়ে।
- হাঁস সাধারণত রাতে এবং সকাল ৯টার মধ্যেই ডিম পাড়ে।
- তবে লিটার বা মাচা পদ্ধতিতে হাঁস পালন করলে ডিমপাড়ার ১-২ বক্স দিলে সুফল পাওয়া যায়।
- প্রতিদিন একই সময়ে একই ব্যক্তি ডিম সংগ্রহ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই অপরিচিত ব্যক্তি খামারে প্রবেশ করতে পারবে না।

হাঁসের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

হাঁস খামার স্থাপনের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়ন করতে হলে খামারের পুষ্টি ব্যবস্থাপনা সঠিক হতে হবে। খামারের ব্যয়ের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ এই অংশের

সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট। এই খরচের শতকরা ৭০ ভাগের অতিরিক্ত হলে খামারে লোকসানের হার বৃদ্ধি পায়। খামার ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনাকালে খাদ্য খরচ শতকরা ৬০ হতে ৭০ ভাগের মধ্যে সীমিত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

খাদ্যের উপদান সমূহঃ

খাদ্যের মৌলিক উপাদান ৬ ধরণের। যথা ঃ শর্করা, আমিষ, চর্বি, ভিটামিন, খনিজ ও পানি। সুষম খাদ্যে প্রতিটি উপাদানের সঠিক মাত্রায় থাকা বাঞ্ছনীয়। খাদ্যের উপকরণসমূহ তাদের পুষ্টি উপাদানের আধিক্যের উপর ভিত্তি করে ভাগ করা যেতে পারে। যেমনঃ শর্করা জাতীয় খাদ্য (ভুট্টা, গম, কাউন, চাউলের কুঁড়া, গমের ভুষি ইত্যাদি); আমিষ জাতীয় খাদ্য (সয়াবিন মিল, তিলখৈল, শুটকিমাছ, মিটমিল ইত্যাদি; চর্বি জাতীয় খাদ্য (এনিমেল ফ্যাট, ভেজিটেবল অয়েল, কর্ড লিভার ওয়েল ইত্যাদি; ভিটামিন জাতীয় খাদ্য (শাকসবজি ও কৃত্রিম ভিটামিন); খনিজ জাতীয় খাদ্য (ঝিনুক, ক্যালশিয়াম ফসফেট, রকসল্ট, লবন ইত্যাদি); এবং পানি।

দেহের ভিতর শর্করা খাদ্য বিশ্লেশিত হয়ে দেহের তাপ উৎপাদনের মাধ্যমে শক্তি সরবরাহ করে। শর্করা জাতীয় খাদ্য উপাদান দুই ধরণের। যথাঃ

১) দানাদার ঃ সকল প্রকার দানাদার খাদ্যশস্য যেমন, ভুট্টা, গম, যব, কাউন, সরগম, চাউল ইত্যাদি।

২) আঁশ ঃ সকল প্রকার দানাদার খাদ্যের উপজাত যেমন চাউলের কুঁড়া, গমের ভূষি, কাসাভা ইত্যাদি। হাঁস-মুরগির খাদ্যের বেশীর ভাগ শর্করা পুষ্টি উপাদান যেমন দানাদার শতকরা ৪০ হতে ৬০ ভাগ এবং উপজাত অংশ শতকরা ১০ হতে ৩০ ভাগ ব্যবহার করা হয়। খাদ্যে শর্করার পরিমাণ সাধারণত কিলো ক্যালরি হিসাবে গণনা করা হয়। হাঁসের প্রতি কেজি খাদ্যে সাধারণত ২৭৫০ থেকে ৩০০০ কিলো ক্যালরি শর্করা ব্যবহার করতে হয়।

বাচ্চা হাঁসের ব্যবস্থাপনা

ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা

বাচ্চা ফুটার পর থেকে ৪ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত কৃত্রিমভাবে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে বাচ্চা পালনকে ব্রুডিং বলে। এই বয়সে পালক না হওয়ায় বা ছোট থাকায় শরীর আবৃত্ত হয়না, এ জন্য শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রনের জন্য কৃত্রিম তাপের প্রয়োজন হয়।

- ব্রুডিং এর জন্য নির্ধারিত স্থানটি শুষ্ক ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- নির্দিষ্ট তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নির্ধারিত স্থানটি ব্রুডারগার্ড দ্বারা বেষ্টিত করতে হয়। উপরে একটি হোবার স্থাপন করতে হবে।

- হোবারে বৈদ্যুতিক বাল্ব লাগানো থাকে।
- হোবারের অবস্থান উঠা-নামা করানোর মাধ্যমে ব্রুডারগার্ড এর অভ্যন্তরের তাপমাত্রা কমানো বা বাড়ানো হয়ে থাকে।
- সাধারণত ৭-৮ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট একটি জায়গায় ৪০০-৫০০ টি হাঁসের বাচ্চার ব্রুডিং করা হয়ে থাকে।

ব্রুডিং এর উদ্দেশ্যঃ

- ব্রুডিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা এই সময়টা সঠিকভাবে পালন করা গেলে খামারে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।
- সঠিক ব্রুডিং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক।
- বিভিন্ন পীড়ন থেকে রক্ষা করা যায়।
- সকল বাচ্চা সমভাবে বাড়তে থাকে।
- বংশগত বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটে।
- ভ্যাকসিন রেসপন্স বেশী পাওয়া যায়।

ব্রুডিং এর পূর্ব প্রস্তুতি ঃ

- বাচ্চা আসার ৬-৭ দিন আগেই হাঁস পালনের জন্য নির্বাচিত ঘর জীবাণুমুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথমে ঘরের অভ্যন্তরস্থ সকল পুরাতন মালামাল, লিটারসহ অন্যান্য উপাদান ঘরের বাহিরে স্থানান্তর করতে হবে।
- এবার ঘরের পর্দা বের করে নিতে হবে। ঘরের ভেতর ও বাহিরে মাকরশার জাল থাকলে ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে।
- ঘরের সকল উপকরণ ডিটারজেন্ট দিয়ে ভালভাবে ধৌত করতে হবে।

খামারের চারপাশে বাহিরে ৫ ফুট পর্যন্ত চুন ছিটাতে হবে ।

বাচ্চা হাঁসের ব্রুডিং

- বাচ্চা খামারে আসার ১ ঘন্টা আগে পানির পাত্রে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে। যাতে পানির তাপমাত্রা ৯৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটের কাছাকাছি পৌছে। পানিতে ০.২৫% গ্লুকোজ (২৫ গ্রাম/লিটার) মিশানো যেতে পারে যা দুর্বল বাচ্চদেরকে সবল করে তুলবে।
- এবার খামারে আসা বাচ্চার বক্সসমূহ হোভারের নিচে স্থাপন করে কিছুক্ষণ (১০ মিনিট) রেখে দিতে হবে যাতে করে বাচ্চার গায়ের তাপমাত্রা ব্রুডিং তাপমাত্রার

সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠে। এক্ষেত্রে শুরুতেই বাচ্চার বক্স খামারে প্রবেশের সময় বক্স এর উপর এন্টিসেপটিক স্প্রে করে নিতে হবে এবং বক্সের ওজন নিয়ে রাখা ভালো। এতে করে বাচ্চার গড় ওজন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। সাধারণত একটি সুস্থ, সবল বাচ্চার গড় ওজন ৩৫-৪৫ গ্রাম হয়ে থাকে।

- বাচ্চা ব্রুডারে ছাড়ার সময় বাচ্চার ঠোঁট পানিতে ছোয়াতে হবে। এতে প্রতিটি বাচ্চাই তার খাওয়ার পানির স্থান চিনতে পারে।
- খাবার পাত্রে ১ম দুই-তিন ঘন্টা পর্যন্ত খাবার সরবরাহ না করাই ভালো কেননা বাচ্চা জন্মের সময় পেটে যে ইয়ক থাকে তা দ্রুত শুকাতে সহায়তা করে।
- বাচ্চা আসার পর ১-২ দিন পেপারে ছিটিয়ে খাবার সরবরাহ করতে হবে এবং তারপর থেকে নির্ধারিত খাবার পাত্র বা ট্রেতে খাবার সরবরাহ করতে হবে।
- সাধারণত ১ম সপ্তাহে প্রতি ১০০ বাচ্চার জন্য একটি খাবার পাত্র এবং ১ টি পানির পাত্র দিতে হবে।
- ২য় সপ্তাহ হতে ৩০ দিন বয়স পর্যন্ত প্রতি ৪০ টি বাচ্চার জন্য ১ টি খাবার পাত্র এবং ৫০ টি বাচ্চার জন্য ১ টি পানির পাত্র দিতে হবে।
- ৩০ দিন পর হতে প্রতি ৩০ টি বাচ্চার জন্য ১ টি খাবার পাত্র এবং ৪০ টি বাচ্চার জন্য ১ টি পানির পাত্র দিতে হবে।

সাধারণতঃ চার সপ্তাহ পর্যন্ত হাঁসের বাচ্চা পানিতে ছাড়া উচিত নয়। ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত ঘরে প্রতিপালন করে তারপর পানিতে ছাড়বার অভ্যাস করতে হবে। পানিতে ছাড়বার সময় হলে ১ম দিনেই সারা দিন পানিতে রাখা ঠিক নয়, ধীরে ধীরে পানিতে চরার অভ্যাস করতে হবে। গরমকালে দুসপ্তাহ পরেই পানিতে ছাড়া যেতে পারে।

ব্রুডিং ব্যবস্থাপনায় তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতাঃ ব্রুডার ঘরের আদর্শ তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা বয়স ভেদে পরিবর্তন করতে হয়। সাধারণত শুরুতে ৯৫ ডিগ্রি তাপমাত্রা দিয়ে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে কমাতে হয়। বয়স ভেদে ব্রুডিং তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আদ্রতা নিম্ন ছকে দেয়া হলোঃ

বয়স	তাপমাত্রা (ডিগ্রি ফারেনহাইট)	আপেক্ষিক আদ্রতা%
১ম সপ্তাহ	৯৫	৫৫-৬০
২য় সপ্তাহ	৯০	৫৫-৬০
৩য় সপ্তাহ	৮৫	৫৫-৬০
৪র্থ সপ্তাহ	৮০	৫৫-৬০
৫ম সপ্তাহ	৭৫	৬০-৭০

সাধারণত ব্রুডারের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে বাচ্চা ব্রুডারের হোভারের নিচ থেকে সরে যায় এবং তাপমাত্রা কমে গেলে বাচ্চাসমূহ হোভারের নীচে এসে জড়ো হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে হোভার উঠানামা করে ব্রুডারের অভ্যন্তরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন করতে হবে।

আলোক ব্যবস্থাপনাঃ

- ১ম সপ্তাহে ব্রুডার হতে ৪-৫ ফুট উচুতে এবং ২য় সপ্তাহ হতে ৭-৮ ফুট উচুঁতে ১০০ ওয়াটের ৪টি বাল্ব ঝুলিয়ে দিতে হবে।

তাপমাত্রা কম হওয়ায় বাচ্চা দলভূক্ত হয়েছে	তাপমাত্রা বেশি হওয়ায় বাচ্চা ব্রডারের দেয়ালের দিকে সরে গেছে	তাপমাত্রা সঠিক হওয়ায় বাচ্চা সব জায়গায় আছে

- প্রথম থেকেই প্রতিরাতে আধা ঘন্টা আলো বন্ধ রেখে বাচ্চাগুলোকে আধারের সাথে পরিচিত করানো উচিত ।
- তা না হলে রাতে হঠাৎ আলো বন্ধ হয়ে গেলে পাইলিং জনিত সমস্যায় (বাচ্চা ভয়ে জড়ো হয়ে) চাপাচাপিতে বাচ্চা মারা যেতে পারে।

বায়ু চলাচল ব্যবস্থাপনাঃ

- ব্রুডার ঘরে বায়ু চলাচল অত্যন্ত জরুরী। ব্রুডার ঘরের দুষিত বায়ু নিষ্কাশন ও বিশুদ্ধ বায়ু সরবরাহ থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- তাপের উৎস হতে নির্গত কার্বন মনো অক্সাইড ও বাচ্চা কর্তৃক নির্গত কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস জমা হয়ে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে।
- তাছাড়া ঘরে সৃষ্ট অ্যামোনিয়া গ্যাস দুর্গন্ধ সৃষ্টি করতে পারে।
- এই জন্য মাঝে মাঝে অল্প সময়ের জন্য পর্দা খুলে গ্যাস নির্গমন ও বিশুদ্ধ বায়ুর প্রবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

বাচ্চা হাঁসের খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ

ডিম হতে সদ্য ফুটন্ত বাচ্চার পেটে ইয়কের কিছু অংশ থেকে যায় যা থেকে প্রথম ২-৩ দিন কোন খাদ্য গ্রহন ছাড়াই বাচ্চা বেঁচে থাকতে পারে। তবে ডিম থেকে ফুটে বাচ্চা বের হওয়ার পর দেরীতে খাদ্য ও পানি সরবরাহ করলে এদের পরবর্তীতে দৈহিক বৃদ্ধি হার

কমে যেতে পারে এবং মৃত্যুহার বেড়ে যেতে পারে। একারণে বাচ্চা ফুটে বের হওয়ার পর অতিদ্রুত খামারে স্থানান্তর করতে হবে। হাঁসের বাচ্চাকে প্রথমে পানি এবং পরবর্তীতে খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

- প্রথম দিন পানিতে গ্লুকোজ মেশাতে হবে।
- প্রথম ১-২ দিন পানিতে বি-ভিটামিন ও স্যালাইন দিতে হবে।
- ব্রুডারে ছাড়ার পর হতে ১-২ দিন ভুট্টাভাঙ্গা ম্যাস (ছোট আকারের) করে পেপারের উপর ছিটিয়ে সরবরাহ করতে হবে।
- ৩য় দিন হতেই খাদ্য খাবার পাত্রে সরবরাহ করতে হবে।
- প্রতি বাচ্চা ১ম সপ্তাহে গড়ে ১৫ গ্রাম, ২য় সপ্তাহে ৪০ গ্রাম, ৩য় সপ্তাহে গড়ে ৭৫ গ্রাম, ৪র্থ সপ্তাহে ৯৫ গ্রাম, ৫ম সপ্তাহে ১ কেজি পর্যন্ত খাদ্য খেতে পারে।
- প্রথম ২ সপ্তাহ পর্যন্ত খাদ্য শেষ হওয়ার সাথে সাথেই খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে দৈনিক ৩-৪ বার খাদ্য দিতে হবে।
- প্রথম ২ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ ২২% এবং বিপাকীয় শক্তির পরিমাণ ২৭৫০ কিলোক্যালরী হতে হবে। তারপর হতে প্রতি সপ্তাহে ১% হারে প্রোটিনের পরিমাণ কমতে কমতে ১৬% এ দাঁড়াবে এবং এই বাজারজাত করনের পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকবে।

প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ সারণীতে দেয়া হলো:

পুষ্টি উপাদান	স্টার্টার ১-৬ সপ্তাহ	গ্রোয়ার ৭-১৯ সপ্তাহ	লেয়ার ২০-৭২ সপ্তাহ
বিপাকীয় শক্তি (কি.ক্যালরি/কেজি)	২৯০০	৩০০০	২৭৫০
প্রোটিন%	২০-২২	১৭-১৯	১৬
চর্বি%	৫	৫	৫
ক্যালসিয়াম%	১	১	৩
ম্যাংগানিজ (মি.গ্রা./কেজি)	৬০	৫০	৪০
ফসফরাস%	০.৪০	০.৩৫	০.৪০
লাইসিন	১.১৬	০.৯০	০.৯৪
আর্জিনিন	০.৯৪	১	০.৬০
থ্রিওনিন	০.৮৪	০.৬৬	০.৬০
নিয়াসিন (মি.গ্রা./কেজি)	৫৫	৪০	৫৫
মিথিওনিন + সিসটিন%	০.৭৬	০.৭৭	০.৮০
পেনটোথানিক এসিড (মি.গ্রা./কেজি)	১৫	১০	২০
ভিটামিন-এ আইইউ	১০০০০	৮০০০	১২০০০
ভিটামিন-ডি৩ (মি.গ্রা./কেজি)	৩০০	২২.৫	৬২.৫
ভিটামিন-ই আইইউ	১০	২৬.৪৭	
রিবোফ্লাভিন (মি.গ্রা./কেজি)	৩	৬	১০

পাইরোডক্সিন (মি.গ্রা./কেজি)	২.৫	৩	৩
ভিটামিন কে (মি.গ্রা./কেজি)		২.০	২.৫
ভিটামিন-ই আইইউ		২৬.৪৭	
রিবোফ্লাভিন (মি.গ্রা./কেজি)	১০	৬	১০
পাইরোডক্সিন (মি.গ্রা./কেজি)	৩	৩	৩
ভিটামিন কে (মি.গ্রা./কেজি)	২.৫	২.০	২.৫

বিভিন্ন বয়সের হাঁসের জন্য প্রস্তুতকৃত খাদ্য তালিকা			
খাদ্য উপাদান	**বাচ্চাঁ হাঁস (১-৬ সপ্তাহ)**	**বাড়ন্ত হাঁস (৭-১৯ সপ্তাহ)**	**ডিমপাড়া হাঁস (২০-৭২ সপ্তাহ)**
গম ভাঙ্গা (কেজি)	৩৬-৩৭	৩৭	৩৭
ভূট্টা ভাঙ্গা (কেজি)	১৮	১৮	১৬
চালের কুড়া (কেজি)	১৭-১৮	১৭	১৭
সয়াবিন মিল (কেজি)	২২	২২	২৩
প্রোটিন কনসেনট্রেট (কেজি)	২	২	২
ঝিনুক গুড়া/লাইম স্টোন (কেজি)	২	২	৩.৫
ডিসিপি (কেজি)	১.২৫	১.২৫	০.৭৫
ভিটামিন-খনিজ মিশ্রণ (কেজি)	০.২৫	০.২৫	০.২৫
লাইসিন (কেজি)	০.১০	০.১০	০.১০
মিথিওনিন (কেজি)	০.১০	০.১০	০.১০
লবন (কেজি)	০.৩০	০.৩০	০.৩০
মোট পরিমান (কেজি)	১০০	১০০	১০০

পানি ব্যবস্থাপনা

- খামারে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ থাকতে হবে।
- প্রতিদিন কমপক্ষে ৩ বার পরিমাণমত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে।
- প্রয়োজনে পানিতে ৩ পিপিএম মাত্রার ক্লোরিন প্রয়োগ করতে হবে।
- খামারে পয়:নিস্কাশনের যথাযথ থাকতে হবে।

বাড়ন্ত হাঁসের ব্যবস্থাপনা

সাধারণত ৭-১৯ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত সময়কালকে বাড়ন্ত স্টেজ হিসাবে ধরা হয়। তবে ৮ সপ্তাহ হতে শুরু করে ডিম উৎপাদন পর্যন্ত সময়ই হাঁসের বাড়ন্ত সময়কাল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ সময়ে সঠিক ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এসময়ের ব্যবস্থাপনার উপরি নির্ভর করে খামারের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা। বাচ্চার শারীরিক গঠন ১২ সপ্তাহ বয়সের মধ্যে হয়ে থাকে। সুতারাং এই সময়ের পরিচর্যার উপর নির্ভর করে ডিম পাড়ার হার।

আলোক ব্যবস্থাপনাঃ

- বাড়ন্তকালে কৃত্রিম আলো প্রদানের প্রয়োজনীয়তা নেই। সাধারণত ৬ সপ্তাহ বয়স থেকে কৃত্রিম আলো প্রদান সম্পূণভাবে বন্ধ করে দিতে হয়।
- প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম আলোর প্রয়োজনীয়তা বাড়ন্ত অবস্থার সাথে এবং দিনের পরিধির পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে।
- বাড়ন্তকালে দিনের আলো ব্যতীত অপরিকল্পিতভাবে রাতে ঘরে আলো প্রদান করলে আগাম যৌন পরিপক্কতা আসবে এবং ডিম পাড়া শুরু হবে। যা পরবর্তীতে ডিম পাড়ার হারের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ

- একটি ফ্লকে কি পরিমাণ খাবার দিতে হবে বা খাবে তা অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে।
- খাদ্য গ্রহনের হার খাদ্যে বিদ্যমান পুষ্টিগুনের উপর নির্ভর করে।
- ঘরের তাপসাত্রা,আর্দ্রতা, আলোকের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ও খাদ্য গ্রহনের হার পরিবর্তন করতে পারে।
- খাদ্যে নির্ধারিত পরিমানে আমিষ, ক্যালরি থাকতে হবে।
- খাদ্যে সঠিক মাত্রায় অ্যামাইনো এসিড, কার্বোহাইড্রেট, পানি, ফ্যাট, খনিজ লবন ও ভিটামিন থাকতে হবে।
- খামারের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও খাদ্য গ্রহণের উপর প্রভাব ফেলে।
- কাঁচামাল এর গুণগতমান ও প্রক্রিয়াকরণ সঠিক না হলে খাদ্যের গুণগত মান কমে যায়।
- এসকল বিষয় সঠিকভাবে নিশ্চিত করা না গেলে খামারে মৃত্যুহার বাড়বে, উৎপাদন কমবে।
- কোনভাবেই মেয়াদউত্তীর্ণ খাবার খামারে সরবরাহ করা যাবে না। কেননা, মেয়াদউত্তীর্ণ খাবারে ফাঙ্গাল গ্রোথ হবে যা খামারে রোগের প্রাদুর্ভাব সৃষ্টি করতে পারে।
- ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত দৈনিক ৩ বার টাটকা খাবার সরবরাহ করতে হবে।
- ৬ সপ্তাহ পর হতে প্রয়োজনীয় খাদ্য দৈহিক ওজনের সাথে সমন্বয় করে সরবরাহ করতে হবে।
- ব্যাগের মুখ খোলার পর দ্রুততার সাথে খাদ্য শেষ করতে হবে।
- খাদ্যের ব্যাগ বাঁশ বা কাঠের তৈরী পাটাতনের উপর শুষ্ক ও আলো-বাতাসমুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।
- খাদ্য ও পানির পাত্র প্রতিদিন ভালোভাবে ধৌত করতে হবে।

- বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ সঠিক আছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে।
- বয়স বাড়ার সাথে সাথে পানির পাত্রের উচ্চতা বাড়াতে হবে।
- হাঁসের সংখ্যা অনুপাতে পানির পাত্রের সংখ্যা ঠিক রাখতে হবে।
- দৈনিক কমপক্ষে ৪ বার পানি সরবরাহ করতে হবে।
- পানির পাত্র প্রতিদিন পরিষ্কার করতে হবে।
- গুযোগ থাকা স্বাপেক্ষে হাঁসকে পানিতে চড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- আমাদের দেশে সাধারণত হাঁসকে দিনের বেলা পানিতে চড়ানো হয় এবং প্রতিদিন সকাল ও রাতে খাদ্য সরবরাহ করা হয়।

ডিম পাড়া হাঁসের ব্যবস্থাপনা

ডিমপাড়া হাঁস বাছাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডিমপাড়া হাঁস বাছাইয়ে যে সকল বিষয় বিবেচনা করতে হবে তা হলোঃ

- বাছাইকৃত হাঁসের ওজন প্রায় সমান হতে হবে।
- সতেজ ও সবল হতে হবে।
- পালক উজ্জল/চকচকে,নরম ও মসৃন হতে হবে।
- চোখ বড় উজ্জল ও সতেজ হতে হবে।
- চামড়া পাতলা, নরম ও চর্বিহীন হতে হবে।
- মলদ্বার বড়, পুরু ও ভেজা হতে হবে।

ঘরের তাপমাত্রা ব্যবস্থাপনাঃ

ডিমপাড়া হাঁসের ঘরের আদর্শ তাপমাত্রা ১৫-২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশের তাপমাত্রায়ও হাঁস সহনশীল ও উৎপাদনশীলতা ঠিক থাকে। তবে তাপমাত্রা বেড়ে গেলে ডিম পাড়ার হার কমে যেতে পারে।

ডিমপাড়া হাঁসের খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ

- একটি ফ্লকে কি পরিমাণ খাবার দিতে হবে বা খাবে তা অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যথাঃ খাদ্যে বিদ্যমান পুষ্টিগুন,ঘরের তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, আলোকের পরিমাণ ও বয়স ইত্যাদি।
- সাধারণত প্রতিটি হাঁস ১ম সপ্তাহে ৪-৫ কেজি, ১৯ সপ্তাহ পর্যন্ত ১২-১৩ কেজি খাদ্য খায়।
- একটি প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁস দৈনিক ১৩০-১৫০ গ্রাম খাদ্য খেয়ে থাকে।
- খাদ্যে নির্ধারিত পরিমানে আমিষ, ক্যালরি, অ্যামাইনো এসিড, পানি, ফ্যাট, খনিজ লবন ও ভিটামিন থাকতে হবে।

- খামারের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাও খাদ্য গ্রহণের উপর প্রভাব ফেলে।
- কাঁচামাল এর গুনগতমান ও প্রক্রিয়াকরণ সঠিক না হলে খাদ্যের গুণগত মান কমে যায়।
- এ সকল বিষয় সঠিকভাবে নিশ্চিত করা না গেলে খামানে মৃত্যুহার বাড়বে, উৎপাদন কমবে।
- কোনভাবেই মেয়াদউত্তীর্ণ খাবার খামারে সরবরাহ করা যাবে না। কেননা, মেয়াদউত্তীর্ণ খাবারে ফাঙ্গাল গ্রোথ হবে যা খামারে রোগের প্রাদুর্ভাব বৃষ্টি করতে পারে।
- খাদ্যের ব্যাগ বাঁশ বা কাঠের তৈরী পাটাতনের উপর শুষ্ক ও আলো-বাতাসমুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।
- খাদ্য ও পানির পাত্র প্রতিদিন ভালোভাবে ধৌত করতে হবে।

ঘরের বাতাস চলাচল ব্যবস্থা (ভেন্টিলেশন) ঃ

- দেয়ালের শতকরা ৪০ ভাগ হিসেবে ঘরের লম্বালম্বি বেড়ার তারের জালের ব্যবস্থা বা বাঁশের সাহায্যে ছিদ্র ওয়ালা বেড়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
-

হাঁসের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

- প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় হাঁসের আচরণ পরীক্ষা করতে হবে।
- খাদ্য খাওয়া ও পানি পান করার পরিমানের উপর হাঁসের স্বাস্থ্যের অবস্থা নির্ভর করে।
- ঘরে হাঁসের মৃত্যু হলে মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানসহ দ্রুত মৃত হাঁসের সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- খাদ্যে বিষক্রিয়াজনিত রোগ যেমন আফলাটক্সিন ও বটুলিজম এর কারণে হাঁসের মৃত্যু ঘটতে দেখা যায়।
- খাদ্য তৈরীর সময় বিশেষ করে ভূট্টাবীজ খুব ভালোভাবে দেখে নিয়ে অন্যান্য খাদ্য উপাদানসহ খাদ্য তৈরী করলে এ সমস্যা এড়ানো সম্ভব।
- স্থানীয় ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শে খাদ্য বা পানির সাথে ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- খামারের জৈব নিরাপত্তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

খামারের জীব-নিরাপত্তা

যে সকল ব্যবস্থা গ্রহন করলে হাঁসে অনাকাঙ্খিত জীবানুর সংক্রমনকে পতিহত করা যায়, জীব- নিরাপত্তা বলতে সেই সকল কার্যক্রম গ্রহণকে বুঝায়। খামারে জীব নিরাপ্তা নিশ্চিতকল্পে যে সকল কার্যক্রম গ্রহন করা প্রয়োজন তা হলো:

- হাঁসের সংখ্যা অনুপাতে পার্যাপ্ত জায়গাসহ বাসস্থান তৈরী করতে হবে।
- বাসস্থান শুকনো ও পর্যাপ্ত আলো-বাতাসযুক্ত স্থানে তৈরি করতে হবে। খামার বন্য প্রাণী বা অন্যান্য আক্রমণকারী প্রাণির হাত হতে সুরক্ষিত হতে হবে।
- খামারে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।
- খামারের খাদ্য গুদাম আধুনিক হতে হবে।
- বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন খামারের জীব-নিরাপত্তা উন্নায়নে এবং জ্বালানী খরচ সাশ্রয়ে ভুমিকা রাখবে।
- খামারে সংগ নিরোধের জন্য কোয়নেটাইন কক্ষ রাখা গেলে রোগ ব্যবস।থাপনার বিশেষ উন্নয়ন নিশ্চিক করা যাবে।
- সঠিক সময়ে বিভিন্ন রোগের টিকা প্রদান করতে হবে।
- রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত হাঁসকে কোয়ারেনটাইন কক্ষে আলাদা করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।
- কোন হাঁসের মৃত্যু হলে তার সঠিক ডিসপোজাল ও ডিসইনফেকশন নিশ্চিত করতে হবে।
- খামারে অলইন অল আউট পদ্ধতি করতে হবে। খামারের প্রবেশপথে ফুটবাথ হবে যাতে এন্টিসেপটিক মিশ্রিত পানি থাকতে হবে।
- খামারের অভ্যন্তরে পোস্টমটেম পরীক্ষা করা যাবে না । অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ান দ্বারা পোস্টমর্টেম পরীক্ষা রোগ নির্ণয় কেন্দ্রে করাতে হবে।
- ভেটেরিনারিয়ান ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা প্ররোচিত হয়ে খামারে ঔষধ প্রয়োগ করা যাবে না।

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা

খামারে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরী। কেননা, রোগ চিকিৎসা ব্যয়বহুল, কোন কোন রোগের নিশ্চিত চিকিৎসা নেই, চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ নিরাময় হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় কাঙ্খিত উৎপাদনশীলতা অব্যাহত রাখা কঠিন। তাছাড়া রোগের কারণে মৃত্যুঝুকি রয়েছে। সকল রোগের টিকা পাওয়া যায় না। অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ রোগসমূহের (যে সকল রোগের মৃত্যুঝুকি বেশী) টিকা পাওয়া যায় । এসকল রোগের বিরুদ্ধে সঠিক সময়ে টিকা

প্রদান করা গেলে রোগ নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে লাভজনক ও টেকসই বাণিজ্যিক খামার করা সম্ভব। হাঁসের প্রয়োজনীয় টিকা নিম্ন ছকে দেয়া হলোঃ

দিন	টিকা
২১-২৮ দিন	ডাক প্লেগ
৩৫-৪২ দিন	ডাক প্লেগ
তারপর থেকে প্রতি ৬মাস পর পর ডাক প্লেগ রোগের টিকা প্রদান করতে হবে।	
৪৫-৬০দিন	ডাক কলেরা
১৪ দিন পর	ডাক কলেরা বুস্টার
তারপর ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শক্রমে ইউএস, আইএলটি, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের টিকা প্রদান করা যেতে পারে।	

খামারে অন্যান্য বিবেচ্য বিষয়:

- খামারে সপ্তাহে ২ বেলা বি-ভিটামিন, দুই বেলা ভিটামিন এডি৩ই প্রদান করতে হবে।
- প্রতি ৩৫-৪০ দিন পরপর কৃমিনাশক প্রদান করতে হবে।

হাঁসের গুরুত্বপূর্ণ রোগ, লক্ষণ ও করণীয়ঃ

হাঁস তুলনামূলকভাবে রোগ সহনশীল হলেও কিছু কিছু রোগ খামেরর ক্ষতি সাধন করতে পারে। রোগ সমূহকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- ব্যাকটেরিয়া সংক্রমন জাতীয় রোগ, ভাইরাস জনিত রোগ, পরজীবি জনিত রোগ (প্রটোজোয়া জনিত রোগ, কৃত্রি জনিত রোগ, উকুন-আঠালির আক্রমণ) অপুষ্টি জনিত রোগ বংশগত রোগ ইত্যাদি।

ডাক প্লেগ

ডাক প্লেগ বা ডাক ভাইরাল এন্টারাইটিস একটি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি। বাংলাদেশে প্রতি বছর এ রোগে বিপুল পরিমান হাঁস মারা যাওয়ার তথ্য রয়েছে। হার্পিস ভাইরাস এ রোগের কারণ। এ রোগে প্রধানতঃ বয়স্ক হাঁস আক্রান্ত হলেও অপেক্ষাকৃত কম বয়সের হাঁস এ রোগে মারা যায়।

কিভাবে এ রোগ ছড়ায়ঃ

১। প্রধানতঃ আক্রান্ত হাঁসের সংস্পর্শে সুস্থ্যগুলি আক্রান্ত হয়।

২। এ ভাইরাস দূষিত খাদ্যদ্রব্য ও পানির সাহায্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বা এক খামার থেকে অন্য খামারে ছড়ায়।

৩। ডিম সংগ্রহকারী যারা এক খামার থেকে অন্য খামারে যাতায়াত করে এদের মাধ্যমে রোগের বিস্তার লাভ ঘটে।

রোগের লক্ষণঃ

হঠাৎ করে আক্রান্ত হওয়া এবং অধিক মৃত্যুর হার এ রোগের বৈশিষ্ট। আক্রান্ত হাঁসের খুদা মন্দা শুরু হয় কিন্তু বার বার অল্প অল্প পানি পান করতে থাকে। আক্রান্ত হাঁস নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং চেহারা উসক খুসকো ভাব লক্ষ্য করা যায়। পাতলা পায়খানা সবুজ থেকে হলুদ

বর্ণ ধারণ করে এবং প্রায়শই রক্ত যুক্ত থাকে। মৃত হাঁসের পায়ুপথ রক্ত দ্বারা আবৃত থাকা স্বাভাবিক এবং নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। পুরুষ হাঁসের জননেন্দ্রিয় বের হয়ে আসতে পারে। এবং শরীরের বিভিন স্থানে রক্তক্ষরণ দেখা যাবে। গলনালী এবং বৃহদন্ত্রে পচন ধরতে পারে। আক্রান্ত হাঁস অন্ধকারে থাকতে ভালবাসে এবং আলো দেখলে ভয় পায়। ডিম পাড়া হাঁসির ডিম পাড়া বন্ধ হয়ে যায়। মৃত্যুর হার ক্ষেত্র বিশেষে ১০০% পর্যন্ত হতে পারে।

চিকিৎসাঃ

ভেটেরিনারিয়ান দ্বারা রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রতিরোধ ব্যবস্থাঃ

নিয়মিত ডাক প্লেগ টিকা প্রয়োগ করে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা

ইহা ভাইরাস জনিত মারাত্বক রোগ। আমাদের দেশে হাই-প্যাথজেনিক ও লো-প্যাথজেনিক ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। হাঁসে এ রোগ সাধারণত কোল লক্ষণ দেখা না গেলেও হাই-প্যাথজেনিক জীবানু সংক্রমনের খামারের মারাত্বক ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ :

- সাধারণত কোন লক্ষণ প্রকাশের আইে মারা যেতে পারে।
- মৃত্যু হার ১০০% পর্যন্ত হতে পারে তবে সাধারণত ৬০-৮০% হয়ে থাকে।
- মাথা, মুখ ফুলে যেতে পারে। পায়ের লোমহীন অংশে, ঝুটিতে রক্ত জমাট হয়ে কালো হয়ে যেতে পারে।

চিকিৎসাঃ

যেহেতু এ রোগে লক্ষণ প্রকাশের আগেই হঠাৎ মারা যায়, সেহেতু এ রোগের চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ কম। তবে লক্ষণ কুঝা গেলে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ মোতাবেক সঠিক রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগ নির্ণয় কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে। এ রোগ নির্ণিত হলে খামারের সকল হাঁস বিনষ্ট করে সঠিকভাবে ডিসইনফেকশন ও ডিকন্টামিনেশন করতে হয়।

রোগ প্রতিরোধঃ

- টিকা প্রদানই এই রোগ প্রতিরোধের একমাত্র পথ।
- টিকা প্রদানের সাথে সাথে খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী।

ব্রুডার নিইমোনিয়া

এ রোগ ফাঙ্গাস সংক্রমন জনিত রোগ। এ রোগে আক্রান্ত হাঁসের ফুসফুসে ফাঙ্গাল গ্রোথ দেখা যায়, শ্বাসকষ্ট হয় এবং বাচ্চা মৃত্যুহার বেড়ে যায়। সাধারণত লিটার হিসেবে ব্যবহৃত ধানের তুষ বা কাঠের গুড়া ছত্রাক আক্রান্ত থাকলে, খাদ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করলে এবং ব্রুডিং সঠিক না হলেই এ রোগ বিস্তার হয়।

রোগের লক্ষণঃ

- সাধারণত কোন লক্ষণ প্রকাশের আগেই মারা যেতে পারে।
- বাচ্চা হাঁস একত্রে জড়ো হয়ে থাকে, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বেড়ে যেতে পারে। দুর্বল হয়ে যায় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই মারা যায়।

চিকিৎসাঃ

যেহেতু এ রোগে লক্ষণ প্রকাশের পর পানিতে তুতে দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শক্রমে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে।

রোগ প্রতিরোধঃ

- প্রয়োজনীয় পরিমাণের অধিক দানাদার খাদ্য সরবরাহ না করা।
- শুষ্ক ও আলোযুক্ত স্থানে খাবার সংরক্ষণ করতে হবে।
- খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী।
- লিটার হিসেবে ব্যবহৃত ধানের তুষ বা কাঠের গুড়া ছত্রাক মুক্ত হতে হবে।

ডাক কলেরা

এ রোগ ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ জনিত রোগ। হাঁসের কলেরা জীবানু এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া। এই জীবানু হাঁসের দেহে প্রবেশ করে রক্তের সাথে মিশে এক প্রকার বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং রক্ত চলাচলের সাথে মিশে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত হাঁসের মল দ্বারা এ রোগ খাদ্য ও পানিকে দূষিত করে এবং খামারে ছড়িয়ে পড়ে। সকল বয়সের হাঁস এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

রোগের লক্ষণঃ

- সবুজ বা হলুদ ডায়েরিয়া।
- সকল বয়সের হাঁস এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে।
- অধিক মৃত্যুহার ।

চিকিৎসাঃ

- এ রোগের লক্ষণ দেখা গেলে এন্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে ভেটেরিনারিয়ান দ্বারা রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

রোগ প্রতিরোধঃ

- প্রয়োজনীয় পরিমাণের অধিক দানাদার খাদ্য সরবরাহ না করা।
- শুষ্ক ও আলোযুক্ত স্থানে খাবার সংরক্ষণ করতে হবে। খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী।
- টিকা প্রয়োগ করতে হবে।

ডাক সেপ্টিসেমিয়া/এনাটিপেস্টিপার/নিউ ডাক ডিজিস

এ রোগ ব্যবটেরিয়া সংক্রমনজনিত রোগ। ইহা সেপটেসেসিমিক রোগ। পাসটুরেলা এনাটিপেস্টিপার জীবাণুর সংক্রমনে এ রোগ হয়।

রোগের লক্ষণঃ

- অর্থ্রাইটিস, ডায়রিয়া, শ্বাসতন্ত্রে প্রদাহ ও স্নায়োবিক বৈকল্য।
- ২-৮ সপ্তাহ বয়সী হাঁসে এ রোগের লক্ষণ দেখা যায়।
- মৃত হাঁসের ফুসফুসে জমাট রক্ত, স্ফীতকায় যকৃত, স্প্লিনোমেগালি হয়ে থাকে।
- অধিক মৃত্যুহার।

চিকিৎসাঃ

এ রোগের লক্ষণ দেখা গেলে এন্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে ভেটেরিনারিয়ান দ্বারা রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

রোগ প্রতিরোধঃ

- প্রয়োজনীয় পরিমানের অধিক দানাদার খাদ্য সরবরাহ না করা।
- শুষ্ক ও আলোযুক্ত স্থানে খাবার সংরক্ষণ করতে হবে।
- খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী।

ডাক ভাইরাল হেপাটাইটিস

এ রোগ ভাইরাস সংক্রমন জনিত রোগ। ইহা পিকরনা ভাইরাস সংক্রমণের ফলে হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণঃ

- সবুজ পায়খানা, চোখ বন্ধ করে রাখে, বসে থাকে ও স্নায়োবিক বৈকল্য।
- অধিক মৃত্যু হার।

চিকিৎসাঃ

- এ রোগের লক্ষণ দেখা গেলে লক্ষণের উপর ভিত্তি করে সিম্পটোমেটিক চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ভেটেরিনারিয়ান দ্বারা রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

রোগ প্রতিরোধঃ

- টিকা প্রদান করতে হবে। ৩-১১ সপ্তাহ বয়সে ১ম টিকা এবং ৪ সপ্তাহ পর বুস্টার টিকা প্রদান করতে হবে। খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী।

মাইকোটক্সিকোসিস

হাঁসে খাদ্যে ফাঙ্গাল গ্রোথ হলে খাদ্যে টক্সিন তৈরি হতে পারে। টক্সিন যুক্ত খাবার খাওয়ার ফলে হাঁসের মাইকোটক্সিকোসিস হতে পারে। এ রোগ হলে হাঁসে মৃত্যুহার বাড়তে পারে। মৃত হাঁসের যকৃত ভঙ্গুর হয়, পাকস্থলীতে রক্ত দেখা দিতে পারে। এ রোগে এন্টিটক্সিন, টক্সিন বাইন্ডার দিয়ে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে।

বটুলিজম

ইহা ক্লোস্ট্রিডিয়াল টক্সিনজনিত একটি রোগ। খাদ্য সংরক্ষণ সঠিক না হলে খাদ্যে প্রোটিন জাতীয় অংশে এনএরোবিক কন্ডিশনে ক্লোসট্রিডিয়াম বটুলিনাম নামক ব্যাকটেরিয়া বটুলিনাম নামক টক্সিন তৈরী করে। এই টক্সিন হাঁসের মৃত্যুর কারণ হয়ে দেখা দেয়। সাধারণত চিটাগুড় ও পর্যাপ্ত স্যালাইন সরবরহের মাধ্যমে এ রোগের ক্ষতিকর প্রভাব কিছুটা কমানো সম্ভব হয়ে থাকে।

কৃমিজনিত সমস্যা

হাঁসে কৃমি জনিত রোগ প্রায়শই দেখা যায়। সাধারণত গোলকৃমি (এসকারিয়াসিস), টেপ ওয়ার্মজাতীয় কৃমি সংক্রমণ দেখা যেতে পারে। এ রোগ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ৩৫-৪০ দিন পরপর কৃমিনাশক প্রদান করতে হবে।